সঙ্গে থাকা, নাকি বিপক্ষে

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্ব এটি যে তারা সোজাসুজি ওপরের দিকে উঠে যাবেন। উন্নত হবেন জ্ঞানে ও অর্জনে, কিন্তু সেটাই তাদের একমাত্র কর্তব্য নয়, হতেই পারে না। কেননা একই সঙ্গে নিজেদের তারা প্রসারিত করে দেন অন্যের দিকে, সমাজের অভিমুখে, বলা যায় আড়াআড়ি চলে যান। তাদের এই দুটি কাজ পরস্পরবিরোধী নয় মোটেই, বরং একে অপরের পরিপূরক বটে, এরা এক সঙ্গে না ঘটলে বৃদ্ধিজীবী আর বুদ্ধিজীবী থাকেন না, হয়তো তিনি জ্ঞানী কিংবা পেশাজীবী হন অথবা অপরদিকের ঝোঁকটাই প্রধান হয়ে উঠলে কেবল সামাজিক মানুষই হয়ে যান, অপারগ হন বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা পালনে।

বুদ্ধিজীবীর স্বেচ্ছা আরোপিত দায়িত্বটা হচ্ছে বিবেচনা ও বিশ্লেষণের শক্তিকে ব্যবহার করে পথিবীটাকে বোঝা এবং তাকে পরিবর্তন করতে চেষ্টা করা। এই যে বোঝা অর্থাৎ ব্যাখ্যা করা এটা একেকজন একেকভাবে করতে পারেন, করেনও। কিন্তু ব্যাখ্যা করার পর ব্যক্তি যখন সচেষ্ট হন পৃথিবীটাকে অর্থাৎ নির্দিষ্ট অর্থে তার সমাজ ও রাষ্ট্রকে বদলাতে তখন তিনি বুদ্ধিজীবী হয়ে ওঠেন। দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক, বার্ট্রান্ড রাসেল দর্শন নিয়ে কাজ করেছেন, দর্শনকে তিনি বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন, তার আগ্রহ ছিল গণিতেও। এসব ক্ষেত্রে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ, কিন্তু রাসেল যখন যুদ্ধের বিরুদ্ধে, আণবিক শক্তি প্রয়োগের বিপক্ষে, ভিয়েতনামে মার্কিন আগ্রাসনের বিপরীতে দাঁড়ান তখন তিনি কেবল দার্শনিক থাকেন না, বুদ্ধিজীবীও হয়ে ওঠেন। আরো পেছনে গেলে দেখতে পাব, সক্রেটিস যখন তরুণদের সঙ্গে বসে নানা ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করতেন, তাদের মনে প্রচলিত ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে সংশয়ের সৃষ্টি করতেন তখন তার ভূমিকাটা ছিল একজন বুদ্ধিজীবীরই। রামমোহন রায় জ্ঞানের চর্চা করেছেন, অনুবাদ করেছেন, গ্রন্থ রচনায় মন দিয়েছেন, কিন্তু ওই যে তিনি ধর্মীয় ও সামাজিক বিভিন্ন কুসংস্কার অপনোদনের চেষ্টা করলেন সেখানে তিনি একজন গবেষক মাত্র রইলেন না, বুদ্ধিজীবী হয়ে উঠলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ দু'জনেই অত্যন্ত উঁচুমাপের সাহিত্যিক। তাদের প্রভাব আমাদের জীবনে নানাভাবে পড়েছে, কিন্তু সে প্রভাবটা কেবল সাহিত্যিক রুচি তৈরি বা ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রে অবদানে সীমিত থাকেনি। তার কারণ তারা উভয়েই রাষ্ট্র ও সমাজ নিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা লিখে রেখে গেছেন এবং রবীন্দ্রনাথ তো বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক আন্দোলন-সমাবেশ ও সম্মেলনেও অংশ নিয়েছেন। অপরদিকে বেগম রোকেয়াকে অন্তঃপুরেই থাকতে হয়েছে, প্রকাশ্যে আসতে পারেননি, তিনি কলকাতায় মেয়েদের জন্য যে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন প্রথম দিকে তার অধিকাংশ ছাত্রীই ছিল অবাঙালি, কিন্তু তারকালেই তিনি কেবল যে অন্তঃপুরবাসিনীদের হয়ে কথাই বলেছেন তা নয়, স্বাধীনতা এবং গোটা বাঙালি জাতির মুক্তি নিয়েও ভেবেছেন এবং লিখেছেন। আমাদের আরজ আলী মাতব্বর মোটেই উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন না। পেশাগত জীবনে তিনি কাজ করতেন জমিজমার মাপজোক নিয়ে, আমিনের কাজ, গ্রামেই থাকতেন, কিন্তু নানা বিষয়ে বিশেষ করে ধর্ম সম্পর্কে তিনি বেশ কিছু স্বাভাবিক প্রশ্ন উত্থাপন করে তার পাঠকদের চিন্তার পথে আহ্বান জানিয়েছেন। বুদ্ধিজীবীদের কাজটা তাই সামাজিক। মানুষ যে অনিবার্যভাবেই সামাজিক প্রাণী এ সত্যটা বুদ্ধিজীবীদের কাজের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে উন্মোচিত হয়ে যায়। সহজাত বুদ্ধি অন্য প্রাণীরও থাকে, কিন্তু অন্য কোনো প্রাণী মানুষের মতো সামাজিক জীবন গড়ে তুলতে পারে না। আর মানুষকে যে বুদ্ধিমান প্রাণী বলা হয় তার কারণও ওই সামাজিকতার ভেতরেই নিহিত রয়েছে। কেননা সামাজিকতার অনুশীলনের মধ্য দিয়েই মানুষ তার বুদ্ধিবৃত্তিকে বিকশিত করে তোলে। তার যে জ্ঞান সেটা আকাশ থেকে পড়ে না, ভেতর থেকেই গড়ে ওঠে। এমনকি তার যে স্বপ্ন সেগুলোও তার সামাজিক জীবনেরই প্রতিফলন বৈকি। মানুষের মনুষ্যত্বের আরেক নিদর্শন তার ন্যায়-অন্যায়ের বোধ। সেটিও অন্য প্রাণীর নেই এবং এই বোধও, যার অপর নাম বিবেক, সেটিও সামাজিকভাবেই তৈরি হয়ে থাকে। সামাজিক প্রাণী মানুষের এই পরিচয়টাই তাই মুখ্য এবং এই যে তার সামাজিকতা বুদ্ধিজীবীরা এরই চর্চা করেন, তাদের নিজেদের মতো করে এবং পরস্পরের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত হয়ে, সে সংযুক্তি যে সবসময়ে একরৈখিক থাকে তা অবশ্যই নয়। অনেক সময়ই তা জটিল আকার ধারণ করে। কিন্তু মোটকথা যেটা, তাহলো সামাজিকতা ছাড়া মনুষ্যত্ব নেই এবং বুদ্ধিজীবীরা এ মনুষ্যত্বেরই অনুশীলনকারী।

বুদ্ধিজীবীদের নানাভাবে ভাগ করা যায় এবং ভাগ করাটা আবশ্যক বটে। কেউ প্রগতিশীল, কেউ প্রতিক্রিয়াশীল, কারো অবস্থান উদারনৈতিক, কাউকে বলা যাবে উগ্রপন্থি। আধুনিক, অনাধুনিক এ ধরনের বিভাজনও অসম্ভব নয়। কিন্তু আরেকটি নিরিখ আছে, সেটাও জরুরি, এটি হলো দেশপ্রেম। একাত্তরে আমাদের যে বুদ্ধিজীবীরা শহীদ হয়েছিলেন তাদের মধ্যে নানা রকমের ভিন্নতা ছিল, পেশায় কেউ ছিলেন শিক্ষক, কেউ বা সাংবাদিক, ছিলেন চিকিৎসক, প্রকৌশলী ছিলেন সরকারি কর্মচারীরা, কিন্তু এক জায়গায় তারা ছিলেন অভিন্ন অবস্থানে, সেটি হলো দেশপ্রেম। দেশপ্রেমই ছিল তাদের অপরাধ। যাকে আমরা সামাজিকতা বলছি সেটাও এই দেশপ্রেমেরই একটি প্রকাশ বটে।

সমাজের সঙ্গ রাষ্ট্রের বিরোধ কোনো নতুন ব্যাপার নয়, রাষ্ট্রের যখন থেকে শুরু এ বিরোধের সূত্রপাতও সেই সময় থেকেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাষ্ট্র স্বার্থ দেখে কতিপয়ের, অর্থাৎ শাসকশ্রেণীর এবং সে কারণে তার ভূমিকাটা হয়ে দাঁড়ায় সমাজবিরোধিতার।

সমাজের ওপর রাষ্ট্র কর্তৃত্ব চালায়, শাসকশ্রেণীর আদর্শই সমাজের আদর্শ হয়ে পড়ার ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, রাষ্ট্র ও সমাজের কর্তারা একই আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েন এবং সমাজের অধিকাংশ মানুষের ওপর অত্যাচার চালান। রাষ্ট্রের প্রেমিকরা সমাজদ্রোহীর ভূমিকা নেন এবং সমাজকে যারা ভালোবাসেন রাষ্ট্র তার নিজের ক্ষমতার জোরে তাদের রাষ্ট্রদ্রোহী বলে চিহ্নিত করে আটক করে কারাগারে, বাধ্য করে আত্মগোপন কিংবা দেশত্যাগ করতে, অনেক সময় এমনকি কুণ্ঠিত হয় না হত্যা পর্যন্ত করতে। একাত্তরে তো আমরা হত্যার ঘটনা সরাসরি দেখেছি। যে বুদ্ধিজীবীরা দেশপ্রেমিক ছিলেন রাষ্ট্র তাদের অনেককে হত্যা করেছে। একাত্তরের আগেও রাষ্ট্রের হতে বুদ্ধিজীবী নিধন ঘটেছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ শামসুজ্জোহা একজন রসায়ন বিজ্ঞানী ছিলেন, কিন্তু দেশপ্রেমিকও ছিলেন তিনি। যেজন্য ১৯৬৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা যখন সরাসরি সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হয় তখন তিনি ছাত্রদের সঙ্গে থাকার দায়িত্বটা অস্বীকার করতে পারেননি এবং সেই দায়িত্ব পালন করতে গিয়েই তিনি হানাদার বাহিনীর গুলিতে শহীদ হলেন। তার সঙ্গে শহীদ হলো একজন ছাত্রও। কারণ একই, দেশপ্রেমিক অনুপ্রেরণায় একত্রে দাঁড়ানো, অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ। এর কয়েকদিন আগে ওই ১৯৬৯ সালেই ঢাকায় শহীদ হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র, আসাদুজ্জামান। আসাদুজ্জামানও বুদ্ধিজীবী ছিলেন, তিনি কেবল বিদ্যার্জনে ব্যস্ত ছিলেন না, সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনেও যোগ দিয়েছিলেন এবং সে কারণেই পাকিস্তানের তৎকালীন সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশ নিতে গিয়ে শহীদ হয়েছেন। সরদার ফজলুল করিম ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক। তিনি কারারুদ্ধ হয়েছেন, একবার নয়, দু'বার। প্রথমবার পাকিস্তানের সূচনাপর্বে, দ্বিতীয়বার পাকিস্তান যখন অন্তিম দশায় পৌঁছেছে, অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে তখন। বায়ান্নর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষকদেরও আমরা কারাবন্দি হতে দেখছি। বাম আন্দোলনের বহু কর্মী, যে কোনো সংজ্ঞা অনুযায়ীই যারা বুদ্ধিজীবী ছিলেন, তারা দীর্ঘকাল রাষ্ট্রীয় কারাগারে কাটিয়েছেন। তাতে তাদের নিজেদের পরিচয় তো অবশ্যই, রাষ্ট্রের পরিচয়ও উন্মোচিত হয়ে গেছে। রাষ্ট্রের সে চরিত্রটা ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর, যে নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে বাঙালিকে যুদ্ধ করতে হয়েছে একাত্তর সালে। বুর্জোয়া রাষ্ট্রের বাহু ও থাবা দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবীদের সম্মান জানাতে কখনোই আগ্রহী হয়নি। আমরা বুদ্ধিজীবীদের কাজ নিয়ে যেহেতু আলোচনা করছি, তাই বুদ্ধিজীবী সম্পর্কে ধারণাটির দিকে আবারো একবার ফিরে তাকানো যাক। বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের মধ্যে নানা বিষয়ে বিতর্ক করেন, ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন বহুক্ষেত্রে, যেটা খুবই স্বাভাবিক। কেননা তারা স্বাধীন চিন্তায় আগ্রহী ও অভ্যস্ত, প্রথাগত হতে তাদের রয়েছে ভয়ঙ্কর ভীতি। কিন্তু এসব তর্ক-বিতর্ক ও মতদ্বৈধ উদ্দেশ্যহীন হয় না, হওয়ার উপায়ও নেই।

অথচ নৈতিকতার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ বলে কোনো অবস্থানই আসলে নেই। প্রতিনিয়ত যেখানে দ্বন্দ্ব চলছে ন্যায়ের সঙ্গে অন্যায়ের, সেখানে নিরপেক্ষতার অবকাশ কোথায়? যিনি বলেন তিনি কোনো পক্ষের নন, তিনি নিরপেক্ষ, বুঝতে হবে আসলে তিনি দোদুল্যমান, কেবল দোদুল্যমানই নয়, হয়তোবা সুবিধাবাদীই, কোনো দিকে ঝুঁকবেন না, যে দল জেতে তার কাছ থেকেই সুবিধা নেবেন, অন্ততপক্ষে অসুবিধায় পড়বেন না। অথচ ন্যায়-অন্যায় বোধ যার নেই, যিনি বিবেকবিহীন তার পক্ষে তো বুদ্ধিজীবী হওয়া পরের কথা, যথার্থ মানুষ হওয়াটাই অসম্ভব। কেননা মানুষ তো আসলে সেই প্রাণী যে একই সঙ্গে বুদ্ধিমান, সামাজিক ও বিবেকবান; এবং যার বুদ্ধি, সামাজিকতা ও বিবেক মোটেই পরস্পরবিচ্ছিন্ন নয়, অঙ্গাঙ্গী জড়িত বটে। ওই ধরনের বুদ্ধিজীবীরা যদিও বুদ্ধিজীবী নামের অযোগ্য, তবু রাষ্ট্র ও আধুনিক প্রচারমাধ্যমের পৃষ্ঠপোষকতায় এরা কেবল বিশিষ্টই নন, প্রধান প্রধান বুদ্ধিজীবী হিসেবে নামডাক ও প্রতিষ্ঠার অধিকারী হয়ে সমাজকে বিভ্রান্ত করেন, ভালোমানুষির আবরণে সমাজের সঙ্গে শত্রুতা করে পার ও প্রশংসা পেতে থাকেন। এরা নিজেদের বলেন উদারনৈতিক অথচ বাস্তবিক সত্য হলো এই যে, উদারনৈতি আসলে কোনো নীতিই নয়, এ হচ্ছে নীতিহীনতার ছদ্মবেশ।

আমি একজন দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবীকে চিনি, অত্যন্ত সজ্জন ব্যক্তি, দেশের মঙ্গল নিয়ে অনেককাল ধরে এবং এখনো অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। তিনি নানা উদ্যোগের কথা ভাবেন এবং নিশ্চিত জানেন যে, রাষ্ট্রক্ষমতার বিন্যাসে পরিবর্তন না আনলে সমাজ কিছুতে এগুবে না। এ নিয়ে তিনি বইও লিখেছেন। সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব সম্বন্ধে তার যথেষ্ট জ্ঞান, এমনকি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও রয়েছে, যে কারণে এককালে বামপন্থিদের সঙ্গে কাজ করতেন। কিছুদিন আগে তার সঙ্গে দেখা, বললেন দেশপ্রেমিকদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। সেটা তো অবশ্যই চাই, কিন্তু ঐক্যের ভিত্তি হবে কোন গন্তব্য, এ অনিবার্য প্রশ্নের উত্থাপনে মোটেই দ্বিধা প্রকাশ না করে জানালেন, ভিত্তি হবে মানবকল্যাণ। আমাকে বলতেই হলো যে, তেমন কথা তো ধর্মপ্রচারকরাও বলে গেছেন। জবাবে তার বক্তব্য

হলো, মানবকল্যাণের কথাটা তাই বলে তো মিথ্যা নয়।

একাত্তরে বাংলাদেশে যে সশস্ত্র অভ্যুত্থানটি ঘটেছে তাতে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকাটি কী ছিল? হানাদারদের ধারণা ছিল, বুদ্ধিজীবীরাই ছিলেন আসলে উস্কানিদাতা, তারাই বুদ্ধি দিয়েছেন, উদ্বুদ্ধ করেছেন, যার ফলে বাঙালি ওইভাবে 'বিচ্ছিন্নতাকামী' হয়ে উঠেছিল। সে জন্য তারা ক্ষিপ্ত ছিল বুদ্ধিজীবীদের ওপর। একেবারে শুরুতেই বুদ্ধিজীবীদের অনেককে তারা হত্যা করেছে। এবং শেষে আত্মসমর্পণের ঠিক আগে তাদের নিয়োজিত আলবদর বাহিনীর সাহায্যে তালিকা খুঁজে খুঁজে আরো অনেককে বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। কাজটা করেছে ক্রোধে, প্রতিহিংসা চরিতার্থকরণের অভিলাষে এবং সে সঙ্গে যে বাংলাদেশকে তারা পেছনে ফেলে রেখে যাচ্ছে তাকে যতটা সম্ভব মেধাশূন্য করার অভিপ্রায়ে।

কিন্তু হানাদার বাহিনীর হিসাবে একটা ভুল ছিল। শহীদ বুদ্ধিজীবীদের অনুপস্থিতির কারণে বাংলাদেশ যে মেধার দিক থেকে দুর্বল হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহে নেই; বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে এ বুদ্ধিজীবীদের আদর্শিক ও মানসিক এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাস্তবিক যোগ যে ছিল এটাও সত্য; কিন্তু তাই বলে সে সময়ে দেশের বুদ্ধিজীবীরা সবাই যে মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক ছিলেন এমনটা মনে করার কোনো কারণ নেই। বস্তুত পাকিস্তানকালে বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই ছিলেন যাদের আমরা উদারনৈতিক বলছিলাম সেই দোদুল্যমান ধারার সদস্য, এমনও কেউ কেউ ছিলেন যারা পাকিস্তানকে সমর্থন করতেন এবং পাকিস্তান টিকে থাকুক এটা চাইতেন, সে জন্য কাজও করেছেন। পাকিস্তানের আমলে আমরা দেখেছি মুসলিম মানস, মুসলিম বাংলার স্বতন্ত্র ঐতিহ্য, পাকিস্তানিদের হাজার বছরের ইতিহাস– এসব নিয়ে বিস্তর গবেষণা হয়েছে। বাংলাভাষার সংস্কারের তো অবশ্যই উর্দুর পক্ষে ওকালতির কথাও শোনা গেছে। রাষ্ট্রের সংহতির প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথকে বর্জন করার কথাও উঠেছে ওই বুদ্ধিজীবী মহল থেকেই। কেউ কেউ আবার বিশ্বাস করতেন, তাদের পাকিস্তানে একটি আদর্শ সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে, যেখানে ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা কায়েম করা যাবে। কারো কারো আশা ছিল পাকিস্তান বাঙালি মুসলমানের জন্য 'কালচারাল অটোনমি'র ব্যবস্থা করে দেবে।

পাকিস্তানের অন্ধকার যুগে বুদ্ধিজীবীদের তুলনায় ছাত্র এবং রাজনীতিকদের একাংশ বরং এগিয়ে গিয়েছিলেন। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক যে ঘটিয়েছিলেন, এটা একটা ঐতিহাসিক সত্য; আন্দোলনের সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকরা কারারুদ্ধ হয়েছেন, এ-ও আমরা জানি; কিন্তু ওই আন্দোলনের চালিকাশক্তি ছিল ছাত্ররাই। প্রথমে তারাই শহীদ হয়েছে এবং তাদের কারণেই আন্দোলন রমনা পার হয়ে পুরনো ঢাকায় এবং সেখান থেকে সদরঘাট, ফুলবাড়িয়া, টঙ্গী অতিক্রম করে নিমেষে ছড়িয়ে পড়েছে সারা পূর্ববাংলায়। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গের ওটি ছিল প্রথম অভ্যুত্থান। এই অভ্যুত্থান বুদ্ধিজীবীদের পরামর্শের জন্য অপেক্ষা করে থাকেনি, সাধারণ মানুষের বঞ্চনা ও আশাভঙ্গ এবং উঠতি মধ্যবিত্তের আত্মসচেতনতা ও স্বাধীনতার স্পৃহাই একে বেগবান এবং সফল করে তুলেছিল। একাত্তরের যুদ্ধ ও স্বতঃস্ফূর্ত যুদ্ধ; তার পেছনে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রস্তুতিটা ছিল দুর্বল, সেটি গভীর হলে স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে ভালো হতো, যেমন হতো পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে বুদ্ধিজীবীরা যদি জিজ্ঞাসা করতেন পাকিস্তান জিনিসটা কী এবং কোন রাষ্ট্রের জন্য তারা তখনকার বাংলাদেশকে ভাগ করতে চাচ্ছেন। পাকিস্তান যে কী, তার ভৌগোলিক অবস্থানটা কোন এলাকাজুড়ে বিস্তৃত হবে– এটা এমনকি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহও জানতেন না; আর সেকালে বাঙালি মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা যখন পাকিস্তানের পক্ষে রণধ্বনি তুলেছেন, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান করেছেন, তখন তারা পাকিস্তানের চেহারা ও চরিত্র নিয়ে ভাবেননি। উল্টো ওসব বিষয়ে কেউ ভাবতে চাইলে নিরুৎসাহিত করে বলেছেন, পাকিস্তান চাই তারপর দেখা যাবে কেমন হবে তার অর্থনীতি, কোন রূপ নেবে তার শাসনব্যবস্থা। কেউ কেউ এমনো মন্তব্য করেছেন, আমাদের ভাবাভাবির প্রয়োজনটা কি, যা ভাবার জিন্নাহ সাহেবই ভেবে রেখেছেন। অথচ জিন্নাহ যে কিছুই ভাবেননি তার প্রমাণ পাওয়া গেছে পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পর।

একাত্তরের অভ্যুত্থানের সময়েও ভবিষ্যতের স্বাধীন বাংলাদেশ কেমন হবে সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা নেতৃত্বের ছিল না; বুদ্ধিজীবীরাও সময়-সুযোগ পাননি বিষয়টি নিয়ে ভাবার। কেননা যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে অকস্মাৎ, হানাদাররা আক্রমণ করেছে অতর্কিতে এবং বাঙালিকে যুদ্ধে নামতে হয়েছে সামরিক তো বটেই, মানসিক প্রস্তুতিহীন অবস্থাতেই। তখনকার নেতারা যে দাবি করেছেন যুদ্ধ তারা চাননি, যুদ্ধ তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, এটা মোটেই বাড়িয়ে বলা নয়। ষড়যন্ত্রকারী সামরিক শাসকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা তো শেষ মুহূর্ত পর্যন্তই চলছিল, যতক্ষণ না ওই পক্ষ আলোচনা ভেঙে দিয়ে গণহত্যা শুরু করে দিয়েছে। অনেকটা না হলেও কিছুটা মিল রয়েছে কংগ্রেস ও লীগের নেতাদের সঙ্গে এক সময়ের ভারত সরকারের রাজপ্রতিনিধি গভর্নর জেনারেল মাউন্টব্যাটেনের দরকষাকষির সঙ্গে, যার পরিণতিতে স্বাধীনতা আসেনি, পাওয়া গেছে ডমিনিয়ন স্ট্যাটাস অর্থাৎ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন এবং দেশভাগের কারণে লাখ লাখ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন, উৎপাদিত হয়েছেন জন্মভূমি থেকে, স্থায়ী ক্ষতি হয়ে গেছে উপমহাদেশের অর্থনীতির, এমনকি প্রকৃতিরও।

একাত্তরের যুদ্ধ কেবল যে রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য ছিল তা তো নয়। ছিল সার্বিক মুক্তির জন্য, যে কারণে আমরা একে মুক্তিযুদ্ধ বলি। যদিও কেউ কেউ একে স্বাধীনতাযুদ্ধ বলতে চান এবং দেশদ্রোহী তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের ভগ্নাংশ একে গৃহযুদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টাটা এখনো ছাড়েনি। লাহোর প্রস্তাবের বাস্তবায়ন ঘটেছে বলে যারা দাবি করেন তাদের সঙ্গে এদের কণ্ঠস্বরের মিল ঘটে যায়। এই যুদ্ধকে আমরা অভ্যুত্থানও বলি। এদেশে অভ্যুত্থান আগেও ঘটেছে, যেমন ১৯৫২তে, পরে ১৯৬৯-এ। ওই তিনটি অভ্যুত্থানই অনিবার্য ছিল। ১৯৫২-তেই মোহভঙ্গের অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে মানুষ বুঝে ফেলেছে, পাকিস্তান তাদের স্বাধীনতা দেয়নি, বরং নতুন এক ধরনের ঔপনিবেশিক শাসনের জালে আটক রাখার ব্যবস্থা করেছে; মানুষ বুঝেছে এটাও যে, ধর্মভিত্তিক দ্বিজাতি তত্ত্বটা ছিল ভুয়া। কেননা পাঞ্জাবি শাসক ও তাদের দ্বারা শাসিত বাঙালি মোটেই এক জাতি নয়। আর তাই ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের অস্বাভাবিকতাকে পরিত্যাগ করে তারা ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের স্বাভাবিকতাকে গ্রহণ করেছে এবং পরিষ্কারভাবে এটাও জানিয়ে দিয়েছে, ভারতবর্ষ এক জাতির বা দু'জাতির দেশ নয়, বহু জাতি নিয়ে গঠিত একটি উপমহাদেশ, আর সব জাতিসত্তারই মূল ভিত্তি হচ্ছে নিজস্ব মাতৃভাষা।

ধারাবাহিকতাটা এক হলেও বায়ান্ন এবং উনসত্তরের অভ্যুত্থান থেকে একাত্তরের অভ্যুত্থান সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। দুই কারণে, প্রথমত এটি ছিল সশস্ত্র; দ্বিতীয়ত এই অভ্যুত্থানের ফলে রাষ্ট্র ভেঙে গেছে, আগের দুটিতে যেমনটি ঘটেনি। বায়ান্নর অভ্যুত্থানের পর নির্বাচন দেওয়া হয়েছে এবং অভ্যুত্থান চলে গেছে নির্বাচনের অধীনে। তার পরিণতি আমরা দেখেছি। কায়েম হয়েছে আইউব খানের সামরিক শাসন। এর পর মানুষ আবার বিক্ষুব্ধ হয়েছে, তারা সামরিক নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করে বের হয়ে এসেছে, ঘটেছে উনসত্তরের অভ্যুত্থান। পাকিস্তানি শাসকরা এবারো সেই পুরনো কৌশল প্রয়োগ করতে চেয়েছিল। তারা আশা করেছিল অভ্যুত্থানকে নিয়ে আসবে নির্বাচনের অধীনে; তাতে বিক্ষোভ স্তিমিত হবে এবং নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার দরুন মানুষ ভাগ হয়ে যাবে পক্ষে-বিপক্ষে। কিন্তু ঘটল সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটনা; মানুষের সর্বসম্মত রায় আওয়ামী লীগের দেওয়া ছয়-দফাকে অতিক্রম করে পৌঁছে গেল একেবারে এক দফায়– স্বাধীনতার দাবিতে। হানাদাররা দেখল সত্তরে এসে উনসত্তর নতুন এক রূপ নিয়েছে; যাকে দমন করার কোনো পদ্ধতিই তাদের আয়ত্তে নেই। তাই ক্ষিপ্ত হলে অস্ত্রধারী দুর্বৃত্তরা যেটা করে থাকে ঠিক সেটাই তারা করল, অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল অপ্রস্তুত বাঙালিদের ওপর, ঘটাল ইতিহাসের নিকৃষ্টতম গণহত্যাগুলোর একটি।

অভ্যুত্থান বায়ান্নর আগেও হয়েছে। বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহের খবর আমরা জানি। ফকির, সন্ন্যাসী, সাঁওতাল, ফারায়জি– এসব বিদ্রোহ ছিল ব্রিটিশবিরোধী। খুব বড়মাপের অভ্যুত্থানটি ঘটল ১৮৫৭ সালে, যেটিকে ইংরেজ ও তৎকালীন বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা মিলে নাম দিয়েছিল সিপাহি বিদ্রোহ। কেউ কেউ অবশ্য বলেছেন 'মহাবিদ্রোহ', কিন্তু যেটি আসলে ছিল সিপাহিদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিপ্লবী অভ্যুত্থান। বিপ্লবী বলতে হবে এজন্য যে, এ অভ্যুত্থান এক শ' বছর আগে ১৭৫৭-তে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিল তাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করতে চেয়েছিল। লড়াইটা ছিল পরিপূর্ণরূপে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এবং যথার্থ অর্থে অসাম্প্রদায়িক।

ওই অভ্যুত্থান ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জন্য ভয়ঙ্কর ভীতিজনক হয়েছিল তো বটেই, সেই সঙ্গে তারা এই আশঙ্কাও করেছিল, ভবিষ্যতে ওই রকম কোনো অভ্যুত্থান যদি দেখা দেয় এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণী যদি তাতে যোগ দেয় তাহলে ফরাসি বিপ্লবের চেয়েও ভয়াবহ কিছু ঘটে যাবে। ১৮৫৭-তে মধ্যবিত্ত যোগ দেয়নি, উল্টো তারা বিরোধিতাই করেছিল। এ শ্রেণীটি গঠিত হয়েছিল জমিদার, বেনিয়া ও কোম্পানির কর্মচারীদের নিয়ে।

অভ্যুত্থানের ধারাপ্রবাহকে আমরা সমাজবিপ্লবীই বলতে পারি, কেননা তা ছিল একই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, ধর্মনিরপেক্ষ এবং মেহনতি মানুষের সঙ্গে মধ্যবিত্তের ঐক্যের দ্বারা সমৃদ্ধ, যে ঐক্যের ভয়ে ব্রিটিশ শাসকেরা সন্ত্রস্ত ছিল; দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিল স্থানীয় বিত্তবানেরাও। রাজনীতির ওই ধারায় যদি ভারতবর্ষ স্বাধীন হতো, তাহলে আশা করার কারণ ছিল যে, দেশভাগ হতো না, বিভিন্ন জাতিসত্তা তাদের অধিকারের স্বীকৃতি পেত, এবং জাতির অভ্যন্তরে শ্রেণীবৈষম্যের অবসান না ঘটলেও অবশ্যই কমে আসত। মুক্তির জন্য প্রয়োজন ছিল যে সমাজবিপ্লবের, তার পথ তৈরি হতো। সেটা ঘটেনি। পেছনে ছিল ব্রিটিশ, সামনে ছিল কংগ্রেস ও লীগ; তারা মিলেমিশে দেশ ভাগ ঘটাল এবং স্বাধীনতার পরিবর্তে নিজেদের হাতে ক্ষমতা পেয়ে ঘোষণা করে দিল যে, স্বাধীনতা অর্জিত হয়ে গেছে। সমাজবিপ্লবের সম্ভাবনা সরে গেল পেছনে।

ব্রিটিশ যুগে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রধান পুরুষ ছিলেন গান্ধী, জিন্নাহ, নেহরু ও সুভাষ বসু। এঁদের সবাই ছিলেন বুদ্ধিজীবী। গান্ধী ও জিন্নাহ দু'জনেই ছিলেন পুঁজিবাদের সমর্থক, গান্ধী কিছুটা পরোক্ষভাবে, জিন্নাহ সরাসরি এবং একেবারে উন্মুক্ত রূপে। নেহরু সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু তিনি কংগ্রেসের নির্বাচনী ধারার রাজনীতির বাইরে যেতে পারেননি। সুভাষ বসু কংগ্রেস ছেড়েছিলেন, তিনি সমাজতন্ত্রে আস্থা রাখতেন, কিন্তু সমাজতন্ত্রকে তিনি বৈজ্ঞানিক না করে ভারতীয় করতে চেয়েছিলেন।

একাত্তরের যুদ্ধে রাষ্ট্র ভাঙার ঘটনা ঘটেছে এবং তার মধ্য দিয়ে বাঙালির জাতিগত সমস্যার আদর্শিক মীমাংসা সম্ভব হয়েছে। সেটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও জরুরি একটা ব্যাপার। এই সমস্যা মীমাংসার ফলে শ্রেণীগত সম্পর্কের বিষয়টি সামনে আসবে এমন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। আগের রাষ্ট্রের অধীনে প্রধান দ্বন্দ্বটা যেহেতু ছিল বাঙালিদের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানি অবাঙালিদের, তাই শ্রেণীসম্পর্কের প্রশ্নটি ওই দ্বন্দ্বের অধীনে চলে আসছিল। তখন শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর দ্বন্দ্ব, সমাজের জন্য যেটি প্রধান সমস্যা, সেটি উন্মোচিত হয়ে যাবে এটাই ছিল প্রত্যাশিত। কিন্তু তা হয়েছে কি? না, হয়নি। হতে দেওয়া হয়নি। রাষ্ট্রক্ষমতায় যারা এলো, তারা মেহনতি মানুষকে সমান অধিকার দিতে সম্মত ছিল না, এবং তারা তা দেয়ওনি; বরং উল্টো চেষ্টা করেছে শ্রেণীদ্বন্দ্বকে অস্পষ্ট ও দুর্বল শ্রেণীগুলোকে দমিত রাখতে। অর্থাৎ সমাজবিপ্লবকে প্রতিহত করতে এবং বুর্জোয়াদের সেই পুরনো রাজনীতির ধারাকে অব্যাহত রাখতে। এই শাসক শ্রেণী কখনো নির্বাচনের পথে, কখনো জবরদখলের পদ্ধতিতে রাষ্ট্রক্ষমতাকে নিজেদের হাতের মুঠোয় রেখে দিয়েছে।

ব্যাপারটাকে অস্বাভাবিক বলা যাবে না। মুক্তিযুদ্ধে মেহনতি মানুষ ছিল, ছিল মধ্যবিত্ত; একটি সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে রণক্ষেত্রে তাদের মধ্যে একটি ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু বিজয় হস্তগত হওয়ামাত্র দৃশ্যপট একেবারে বদলে গেছে, মধ্যবিত্ত চলে গেছে তার নিজের জায়গায়, আর মেহনতি মানুষ বাধ্য হয়েছে ম্লানমুখে নিজের স্থানে প্রত্যাবর্তনে, যদিও তার অবস্থানের জায়গাটা ততদিনে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। স্বাধীনতাপরবর্তী ইতিহাসটি মধ্যবিত্তের ধনবৃদ্ধি এবং সমাজে মানুষে মানুষে বৈষম্যবৃদ্ধির ইতিহাস বৈকি। মধ্যবিত্ত ধনী হওয়ার উন্মত্ত প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে, তারা ধন উৎপাদনে যতটা না মনোযোগ দিয়েছে তার চেয়ে বহুগুণ অধিক মাত্রায় দৃষ্টি দিয়েছে উৎপাদিত ধনসম্পত্তি লুণ্ঠনে; এবং তাদের নিজেদের মধ্যকার ক্রমবর্ধমান লুণ্ঠন প্রতিযোগিতাই হয়ে দাঁড়িয়েছে স্বাধীন দেশের রাজনীতি। স্বাধীনতা জনগণকে মুক্তি দেয়নি, শাসকশ্রেণীকে স্বাধীনতা দিয়েছে ধনী হওয়ার। এই শ্রেণী পুঁজিবাদে বিশ্বাসী। পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হতে, যুক্ত হয়ে নিজেদের তাদের সেবকে পরিণত করতে এবং দেশবাসী উৎপাদনের পরিবর্তে সেবক ও ক্রেতা হতে উৎসাহদানে তারা কোনো প্রকার কার্পণ্য করেনি। স্বভাবতই তাদের ভেতর দেশপ্রেমের বড়ই অভাব।

সমষ্টিগত মুক্তির দেশপ্রেমিক চেতনাটাই ছিল মুক্তিযুদ্ধের প্রধান শক্তি। সেই স্বপ্নের কারণেই রাষ্ট্রের আদি সংবিধানে লিখিত রাষ্ট্রীয় মূলনীতিগুলোর মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের জন্য স্থান করে দেওয়া হয়েছিল। ওই নীতিগুলোর তাৎপর্য ছিল নাগরিকদের ভেতর অধিকার ও সুযোগের সাম্য স্থাপন করা। শাসকশ্রেণী যে ওই ধরনের সাম্যে বিশ্বাস করত তা মোটেই নয়, বিশ্বাসের একটা ভঙ্গি করেছিল মাত্র, মুক্তিযোদ্ধাদের মেহনতি অংশের চাপে পড়ে এবং তাদের সেই অবিশ্বাসের প্রমাণ হাতেনাতেই পাওয়া গেছে যখন তারা প্রথম সুযোগেই শাসনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে এবং ধর্মনিরপেক্ষতার অবসান ঘটিয়েছে। শাসকশ্রেণীর বিভিন্ন অংশের মধ্যে অন্য সব ব্যাপারে ভীষণ কলহ, কিন্তু এই ব্যাপারে তারা ঐক্যবদ্ধ। বোঝা যায় শ্রেণীস্বার্থ রক্ষায় তারা কতটা অঙ্গীকারবদ্ধ। ওদিকে বুদ্ধিজীবীরা যে শ্রেণীদ্বন্দ্বের নিরসনের অর্থাৎ মেহনতি মানুষের স্বার্থের পক্ষে অবস্থান নেবেন, তেমনটা ঘটেনি। বুঝতে অসুবিধা নেই যে, বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশই হচ্ছেন হয় পুঁজিবাদে বিশ্বাসী, নয়তো উদারনৈতিক ঘারানার সদস্য। আর যারা সমাজ পরিবর্তনের পক্ষে, তারা যেহেতু সংঘবদ্ধ নন, তাই তাদের কণ্ঠ প্রায় অশ্রুতই রয়ে যায়। তাছাড়া রাষ্ট্র তাদের নিরুৎসাহিত করে, প্রচারমাধ্যম করে উপেক্ষা।

বিপ্লবের পরে প্রতিবিপ্লবী শক্তি তৎপর হয়ে উঠবে, ওঠা মোটেই অস্বাভাবিক কিছু নয়। বাংলাদেশের বেলাতেও তেমনটা ঘটতে দেখা গেছে। এখন পাকিস্তান নিজে যদিও অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত, তবু পাকিস্তানপন্থি ভগ্নাংশরা আমাদের সমাজে রয়ে গেছে, যারা অভ্যাস, মনস্তাত্ত্বিক পিছুটান, সংস্কার, পরাজয়ের গ্লানি ইত্যাদির প্ররোচনায় পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের কায়দায় বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের ধারণা তৈরিতে সচেষ্ট হয়েছে,কেউ কেউ বলেছে নতুন কোনো ঘটনা ঘটেনি, লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়িত হয়েছে মাত্র, কারো কারো মতে মুক্তিযুদ্ধ, ওটি ছিল গৃহযুদ্ধ। শ্রেণীবৈষম্যের রূঢ় সত্যকে অস্পষ্ট করে দেওয়ার জন্য শাসকশ্রেণী ধর্মকে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করতে অসম্মত হয়নি। এবং ক্ষেত্রবিশেষে প্রতিবিপ্লবীদের তৎপরতাকে যে কেবল না-দেখার ভান করেছে তা নয়, তাদের উৎসাহিতও করেছে সংগঠিত হতে, কাছে টেনে নিয়েছে নির্বাচনে জেতার কায়দার অংশ হিসেবে, ক্ষমতার অংশীদার পর্যন্ত হতে দিয়েছে। ওদিকে নিজেদের ছেলেমেয়েদের মহোৎসাহে ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষিত করে গরিব ঘরের সন্তানদের জন্য ব্যবস্থা করেছে মাদ্রাসাশিক্ষার, যাতে করে তারা ইহজাগতিক অভাব অভিযোগকে উপেক্ষা করে পারলৌকিক অর্জনের আশা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে। এসব ব্যাপারের বিরোধিতার ক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবীরা ভূমিকা রাখতে নিদারুণভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। সাতচল্লিশে এদেশ থেকে মেধার উল্লেখযোগ্য দেশত্যাগ ঘটেছিল, একাত্তরের পরেও তেমন ঘটনা ঘটেছে। মেধাবানরা অনেকেই বিদেশে চলে গেছেন। তারা বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা পালন করতে পারছেন না।

বুদ্ধিজীবীদের কর্তব্যটা পরিষ্কার, যদিও অবশ্যই কঠিন। সেটা হলো পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো। পুঁজিবাদবিরোধী লড়াইটা আজ

আন্তর্জাতিকভাবে চলছে; আমাদের দেশে বিশ্বায়নের তৎপরতা অত্যন্ত প্রকট, কিন্তু আন্তর্জাতিক সংহতির বড়ই অভাব। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের দুর্বলতাগুলোর একটি ছিল আন্তজার্তিকীকরণে ব্যর্থতা; বিশ্বজনমত আমাদের পক্ষে শেষ পর্যন্ত এসেছে ঠিকই, কিন্তু বড় ধীরে ধীরে। এর কারণ ছিল। বাংলাদেশের যে জাতিগত নিপীড়নের সমস্যা, পাকিস্তানিরা যে সে রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক বাঙালিদের ওপর নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে, এই স্থূল সত্যটা বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরা হয়নি। দায়িত্বটা ছিল প্রধানত বুদ্ধিজীবীদেরই।

বুদ্ধিজীবীরা শক্তিশালী হন জনগণের সঙ্গে যদি যুক্ত হতে পারেন তবেই, নইলে নয়। যুক্ত হতে হবে আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সমষ্টিগত স্বপ্নের ভিত্তিতে। কোনো আধ্যাত্মিক কারণে নয়, অন্তর্গত সামাজিকতার তাড়নাতেই, নিজেকে বিকশিত করার প্রয়োজনেই, এবং সবার মুক্তির মধ্য দিয়ে নিজেদের মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে। রামমোহন রায়েরা এক সময়, সেই ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, নিজেদের মধ্যে 'আত্মীয় সভা' গড়েছিলেন, বুদ্ধিজীবীদের ওই কাজটিই করা দরকার– তবে আজকের দিনে আত্মীয়তার পরিধিটিকে হতে হবে অত্যন্ত প্রসারিত, অবশ্যই সর্বজনীন, সবাই আসবেন না, আসতে পারবেনও না, কিন্তু সবার জন্য থাকবে উন্মুক্ত ও উষ্ণ আহ্বান।

দীর্ঘকাল রাষ্ট্রীয় কারাগারে কাটিয়েছেন। তাতে তাদের নিজেদের পরিচয় তো অবশ্যই, রাষ্ট্রের পরিচয়ও উন্মোচিত হয়ে গেছে। রাষ্ট্রের সে চরিত্রটা ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর, যে নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে বাঙালিকে যুদ্ধ করতে হয়েছে একাত্তর সালে। বুর্জোয়া রাষ্ট্রের বাহু ও থাবা দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবীদের সম্মান জানাতে কখনোই আগ্রহী হয়নি। আমরা বুদ্ধিজীবীদের কাজ নিয়ে যেহেতু আলোচনা করছি, তাই বুদ্ধিজীবী সম্পর্কে ধারণাটির দিকে আবারো একবার ফিরে তাকানো যাক। বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের মধ্যে নানা বিষয়ে বিতর্ক করেন, ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন বহুক্ষেত্রে, যেটা খুবই স্বাভাবিক। কেননা তারা স্বাধীন চিন্তায় আগ্রহী ও অভ্যস্ত, প্রথাগত হতে তাদের রয়েছে ভয়ঙ্কর ভীতি। কিন্তু এসব তর্ক-বিতর্ক ও মতদ্বৈধ উদ্দেশ্যহীন হয় না, হওয়ার উপায়ও নেই। অথচ নৈতিকতার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ বলে কোনো অবস্থানই আসলে নেই। প্রতিনিয়ত যেখানে দ্বন্দ্ব চলছে ন্যায়ের সঙ্গে অন্যায়ের, সেখানে নিরপেক্ষতার অবকাশ কোথায়? যিনি বলেন তিনি কোনো পক্ষের নন, তিনি নিরপেক্ষ, বুঝতে হবে আসলে তিনি দোদুল্যমান, কেবল দোদুল্যমানই নয়, হয়তোবা সুবিধাবাদীই, কোনো দিকে ঝুঁকবেন না, যে দল জেতে তার কাছ থেকেই সুবিধা নেবেন, অন্ততপক্ষে অসুবিধায় পড়বেন না। অথচ ন্যায়-অন্যায় বোধ যার নেই, যিনি বিবেকবিহীন তার পক্ষে তো বুদ্ধিজীবী হওয়া পরের কথা, যথার্থ মানুষ হওয়াটাই অসম্ভব। কেননা মানুষ তো আসলে সেই প্রাণী যে একই সঙ্গে বুদ্ধিমান, সামাজিক ও বিবেকবান; এবং যার বুদ্ধি, সামাজিকতা ও বিবেক মোটেই পরস্পরবিচ্ছিন্ন নয়, অঙ্গাঙ্গী জড়িত বটে। ওই ধরনের বুদ্ধিজীবীরা যদিও বুদ্ধিজীবী নামের অযোগ্য, তবু রাষ্ট্র ও আধুনিক প্রচারমাধ্যমের পৃষ্ঠপোষকতায় এরা কেবল বিশিষ্টই নন, প্রধান প্রধান বুদ্ধিজীবী হিসেবে নামডাক ও প্রতিষ্ঠার অধিকারী হয়ে সমাজকে বিভ্রান্ত করেন, ভালোমানুষির আবরণে সমাজের সঙ্গে শত্রুতা করে পার ও প্রশংসা পেতে থাকেন। এরা নিজেদের বলেন উদারনৈতিক অথচ বাস্তবিক সত্য হলো এই যে, উদারনৈতি আসলে কোনো নীতিই নয়, এ হচ্ছে নীতিহীনতার ছদ্মবেশ।

আমি একজন দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবীকে চিনি, অত্যন্ত সজ্জন ব্যক্তি, দেশের মঙ্গল নিয়ে অনেককাল ধরে এবং এখনো অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। তিনি নানা উদ্যোগের কথা ভাবেন এবং নিশ্চিত জানেন যে, রাষ্ট্রক্ষমতার বিন্যাসে পরিবর্তন না আনলে সমাজ কিছুতে এগুবে না। এ নিয়ে তিনি বইও লিখেছেন। সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব সম্বন্ধে তার যথেষ্ট জ্ঞান, এমনকি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও রয়েছে, যে কারণে এককালে বামপন্থিদের সঙ্গে কাজ করতেন। কিছুদিন আগে তার সঙ্গে দেখা, বললেন দেশপ্রেমিকদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। সেটা তো অবশ্যই চাই, কিন্তু ঐক্যের ভিত্তি হবে কোন গন্তব্য, এ অনিবার্য প্রশ্নের উত্থাপনে মোটেই দ্বিধা প্রকাশ না করে জানালেন, ভিত্তি হবে মানবকল্যাণ। আমাকে বলতেই হলো যে, তেমন কথা তো ধর্মপ্রচারকরাও বলে গেছেন। জবাবে তার বক্তব্য হলো, মানবকল্যাণের কথাটা তাই বলে তো মিথ্যা নয়।

একাত্তরে বাংলাদেশে যে সশস্ত্র অভ্যুত্থানটি ঘটেছে তাতে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকাটি কী ছিল? হানাদারদের ধারণা ছিল, বুদ্ধিজীবীরাই ছিলেন আসলে উস্কানিদাতা, তারাই বুদ্ধি দিয়েছেন, উদ্বুদ্ধ করেছেন, যার ফলে বাঙালি ওইভাবে 'বিচ্ছিন্নতাকামী' হয়ে উঠেছিল। সে জন্য তারা ক্ষিপ্ত ছিল বুদ্ধিজীবীদের ওপর। একেবারে শুরুতেই বুদ্ধিজীবীদের অনেককে তারা হত্যা করেছে। এবং শেষে আত্মসমর্পণের ঠিক আগে তাদের নিয়োজিত আলবদর বাহিনীর সাহায্যে তালিকা খুঁজে খুঁজে আরো অনেককে বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। কাজটা করেছে ক্রোধে, প্রতিহিংসা চরিতার্থকরণের অভিলাষে এবং সে সঙ্গে যে বাংলাদেশকে তারা পেছনে ফেলে রেখে যাচ্ছে তাকে যতটা সম্ভব মেধাশূন্য করার অভিপ্রায়ে।

কিন্তু হানাদার বাহিনীর হিসাবে একটা ভুল ছিল। শহীদ বুদ্ধিজীবীদের অনুপস্থিতির কারণে বাংলাদেশ যে মেধার দিক থেকে দুর্বল হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহে নেই; বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে এ বুদ্ধিজীবীদের আদর্শিক ও মানসিক এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাস্তবিক যোগ যে ছিল এটাও সত্য; কিন্তু তাই বলে সে সময়ে দেশের বুদ্ধিজীবীরা সবাই যে মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক ছিলেন এমনটা মনে করার কোনো কারণ নেই। বস্তুত পাকিস্তানকালে বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই ছিলেন যাদের আমরা উদারনৈতিক বলছিলাম সেই দোদুল্যমান ধারার সদস্য, এমনও কেউ কেউ ছিলেন যারা পাকিস্তানকে সমর্থন করতেন এবং পাকিস্তান টিকে থাকুক এটা চাইতেন, সে জন্য কাজও করেছেন। পাকিস্তানের আমলে আমরা দেখেছি মুসলিম মানস, মুসলিম বাংলার স্বতন্ত্র ঐতিহ্য, পাকিস্তানিদের হাজার বছরের ইতিহাস– এসব নিয়ে বিস্তর গবেষণা হয়েছে। বাংলাভাষার সংস্কারের তো অবশ্যই উর্দুর পক্ষে ওকালতির কথাও শোনা গেছে। রাষ্ট্রের সংহতির প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথকে বর্জন করার কথাও উঠেছে ওই বুদ্ধিজীবী মহল থেকেই। কেউ কেউ আবার বিশ্বাস করতেন, তাদের পাকিস্তানে একটি আদর্শ সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে, যেখানে ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা কায়েম করা যাবে। কারো কারো আশা ছিল পাকিস্তান বাঙালি মুসলমানের জন্য ‘কালচারাল অটোনমি’র ব্যবস্থা করে দেবে।

পাকিস্তানের অন্ধকার যুগে বুদ্ধিজীবীদের তুলনায় ছাত্র এবং রাজনীতিকদের একাংশ বরং এগিয়ে গিয়েছিলেন। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক যে ঘটিয়েছিলেন, এটা একটা ঐতিহাসিক সত্য; আন্দোলনের সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকরা কারারুদ্ধ হয়েছেন, এ-ও আমরা জানি; কিন্তু ওই আন্দোলনের চালিকাশক্তি ছিল ছাত্ররাই। প্রথমে তারাই শহীদ হয়েছে এবং তাদের কারণেই আন্দোলন রমনা পার হয়ে পুরনো ঢাকায় এবং সেখান থেকে সদরঘাট, ফুলবাড়িয়া, টঙ্গী অতিক্রম করে নিমেষে ছড়িয়ে পড়েছে সারা পূর্ববাংলায়। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গের ওটি ছিল প্রথম অভ্যুত্থান। এই অভ্যুত্থান বুদ্ধিজীবীদের পরামর্শের জন্য অপেক্ষা করে থাকেনি, সাধারণ মানুষের বঞ্চনা ও আশাভঙ্গ এবং উঠতি মধ্যবিত্তের আত্মসচেতনতা ও স্বাধীনতার স্পৃহাই একে বেগবান এবং সফল করে তুলেছিল।

একাত্তরের যুদ্ধ ও স্বতঃস্ফূর্ত যুদ্ধ; তার পেছনে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রস্তুতিটা ছিল দুর্বল, সেটি গভীর হলে স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে ভালো হতো, যেমন হতো পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে বুদ্ধিজীবীরা যদি জিজ্ঞাসা করতেন পাকিস্তান জিনিসটা কী এবং কোন রাষ্ট্রের জন্য তারা তখনকার বাংলাদেশকে ভাগ করতে চাচ্ছেন। পাকিস্তান যে কী, তার ভৌগোলিক অবস্থানটা কোন এলাকাজুড়ে বিস্তৃত হবে– এটা এমনকি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহও জানতেন না; আর সেকালে বাঙালি মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা যখন পাকিস্তানের পক্ষে রণধ্বনি তুলেছেন, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান করেছেন, তখন তারা পাকিস্তানের চেহারা ও চরিত্র নিয়ে ভাবেননি। উল্টো ওসব বিষয়ে কেউ ভাবতে চাইলে নিরুৎসাহিত করে বলেছেন, পাকিস্তান চাই তারপর দেখা যাবে কেমন হবে তার অর্থনীতি, কোন রূপ নেবে তার শাসনব্যবস্থা। কেউ কেউ এমনো মন্তব্য করেছেন, আমাদের ভাবাভাবির প্রয়োজনটা কি, যা ভাবার জিন্নাহ সাহেবই ভেবে রেখেছেন। অথচ জিন্নাহ যে কিছুই ভাবেননি তার প্রমাণ পাওয়া গেছে পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পর।

একাত্তরের অভ্যুত্থানের সময়েও ভবিষ্যতের স্বাধীন বাংলাদেশ কেমন হবে সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা নেতৃত্বের ছিল না; বুদ্ধিজীবীরাও সময়-সুযোগ পাননি বিষয়টি নিয়ে ভাবার। কেননা যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে অকস্মাৎ, হানাদাররা আক্রমণ করেছে অতর্কিতে এবং বাঙালিকে যুদ্ধে নামতে হয়েছে সামরিক তো বটেই, মানসিক প্রস্তুতিহীন অবস্থাতেই। তখনকার নেতারা যে দাবি করেছেন যুদ্ধ তারা চাননি, যুদ্ধ তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, এটা মোটেই বাড়িয়ে বলা নয়। ষড়যন্ত্রকারী সামরিক শাসকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা তো শেষ মুহূর্ত পর্যন্তই চলছিল, যতক্ষণ না ওই পক্ষ আলোচনা ভেঙে দিয়ে গণহত্যা শুরু করে দিয়েছে। অনেকটা না হলেও কিছুটা মিল রয়েছে কংগ্রেস ও লীগের নেতাদের সঙ্গে এক সময়ের ভারত সরকারের রাজপ্রতিনিধি গভর্নর জেনারেল মাউন্টব্যাটেনের দরকষাকষির সঙ্গে, যার পরিণতিতে স্বাধীনতা আসেনি, পাওয়া গেছে ডমিনিয়ন স্ট্যাটাস অর্থাৎ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন এবং দেশভাগের কারণে লাখ লাখ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন, উৎপাদিত হয়েছেন জন্মভূমি থেকে, স্থায়ী ক্ষতি হয়ে গেছে উপমহাদেশের অর্থনীতির, এমনকি প্রকৃতিরও।

একাত্তরের যুদ্ধ কেবল যে রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য ছিল তা তো নয়। ছিল সার্বিক মুক্তির জন্য, যে কারণে আমরা একে মুক্তিযুদ্ধ বলি। যদিও কেউ কেউ একে স্বাধীনতাযুদ্ধ বলতে চান এবং দেশদ্রোহী তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের ভগ্নাংশ একে গৃহযুদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টাটা এখনো ছাড়েনি। লাহোর প্রস্তাবের বাস্তবায়ন ঘটেছে বলে যারা দাবি করেন তাদের সঙ্গে এদের কণ্ঠস্বরের মিল ঘটে যায়। এই যুদ্ধকে আমরা অভ্যুত্থানও বলি। এদেশে অভ্যুত্থান আগেও ঘটেছে, যেমন ১৯৫২তে, পরে ১৯৬৯-এ। ওই তিনটি অভ্যুত্থানই অনিবার্য ছিল। ১৯৫২-তেই মোহভঙ্গের অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে মানুষ বুঝে ফেলেছে, পাকিস্তান তাদের স্বাধীনতা দেয়নি, বরং নতুন এক ধরনের ঔপনিবেশিক শাসনের জালে আটক রাখার ব্যবস্থা করেছে; মানুষ বুঝেছে এটাও যে, ধর্মভিত্তিক দ্বিজাতি তত্ত্বটা ছিল ভুয়া। কেননা পাঞ্জাবি শাসক ও তাদের দ্বারা শাসিত বাঙালি মোটেই এক জাতি নয়। আর তাই

ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের অস্বাভাবিকতাকে পরিত্যাগ করে তারা ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের স্বাভাবিকতাকে গ্রহণ করেছে এবং পরিষ্কারভাবে এটাও জানিয়ে দিয়েছে, ভারতবর্ষ এক জাতির বা দু'জাতির দেশ নয়, বহু জাতি নিয়ে গঠিত একটি উপমহাদেশ, আর সব জাতিসত্তারই মূল ভিত্তি হচ্ছে নিজস্ব মাতৃভাষা।

ধারাবাহিকতাটা এক হলেও বায়ান্ন এবং ঊনসত্তরের অভ্যুত্থান থেকে একাত্তরের অভ্যুত্থান সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। দুই কারণে, প্রথমত এটি ছিল সশস্ত্র; দ্বিতীয়ত এই অভ্যুত্থানের ফলে রাষ্ট্র ভেঙে গেছে, আগের দুটিতে যেমনটি ঘটেনি। বায়ান্নর অভ্যুত্থানের পর নির্বাচন দেওয়া হয়েছে এবং অভ্যুত্থান চলে গেছে নির্বাচনের অধীনে। তার পরিণতি আমরা দেখেছি। কায়েম হয়েছে আইউব খানের সামরিক শাসন। এর পর মানুষ আবার বিক্ষুব্ধ হয়েছে, তারা সামরিক নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করে বের হয়ে এসেছে, ঘটেছে ঊনসত্তরের অভ্যুত্থান। পাকিস্তানি শাসকরা এবারো সেই পুরনো কৌশল প্রয়োগ করতে চেয়েছিল। তারা আশা করেছিল অভ্যুত্থানকে নিয়ে আসবে নির্বাচনের অধীনে; তাতে বিক্ষোভ স্তিমিত হবে এবং নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার দরুন মানুষ ভাগ হয়ে যাবে পক্ষে-বিপক্ষে। কিন্তু ঘটল সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটনা; মানুষের সর্বসম্মত রায় আওয়ামী লীগের দেওয়া ছয়-দফাকে অতিক্রম করে পৌঁছে গেল একেবারে এক দফায়– স্বাধীনতার দাবিতে। হানাদাররা দেখল সত্তরে এসে ঊনসত্তর নতুন এক রূপ নিয়েছে; যাকে দমন করার কোনো পদ্ধতিই তাদের আয়ত্তে নেই। তাই ক্ষিপ্ত হলে অস্ত্রধারী দুর্বৃত্তরা যেটা করে থাকে ঠিক সেটাই তারা করল, অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল অপ্রস্তুত বাঙালিদের ওপর, ঘটাল ইতিহাসের নিকৃষ্টতম গণহত্যাগুলোর একটি।

অভ্যুত্থান বায়ান্নর আগেও হয়েছে। বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহের খবর আমরা জানি। ফকির, সন্ন্যাসী, সাঁওতাল, ফারায়জি– এসব বিদ্রোহ ছিল ব্রিটিশবিরোধী। খুব বড়মাপের অভ্যুত্থানটি ঘটল ১৮৫৭ সালে, যেটিকে ইংরেজ ও তৎকালীন বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা মিলে নাম দিয়েছিল সিপাহি বিদ্রোহ। কেউ কেউ অবশ্য বলেছেন 'মহাবিদ্রোহ', কিন্তু যেটি আসলে ছিল সিপাহিদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিপ্লবী অভ্যুত্থান। বিপ্লবী বলতে হবে এজন্য যে, এ অভ্যুত্থান এক শ' বছর আগে ১৭৫৭-তে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিল তাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করতে চেয়েছিল। লড়াইটা ছিল পরিপূর্ণরূপে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এবং যথার্থ অর্থে অসাম্প্রদায়িক।

ওই অভ্যুত্থান ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জন্য ভয়ঙ্কর ভীতিজনক হয়েছিল তো বটেই, সেই সঙ্গে তারা এই আশঙ্কাও করেছিল, ভবিষ্যতে ওই রকম কোনো অভ্যুত্থান যদি দেখা দেয় এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণী যদি তাতে যোগ দেয় তাহলে ফরাসি বিপ্লবের চেয়েও ভয়াবহ কিছু ঘটে যাবে। ১৮৫৭-তে মধ্যবিত্ত যোগ দেয়নি, উল্টো তারা বিরোধিতাই করেছিল। এ শ্রেণীটি গঠিত হয়েছিল জমিদার, বেনিয়া ও কোম্পানির কর্মচারীদের নিয়ে।

অভ্যুত্থানের ধারাপ্রবাহকে আমরা সমাজবিপ্লবীই বলতে পারি, কেননা তা ছিল একই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, ধর্মনিরপেক্ষ এবং মেহনতি মানুষের সঙ্গে মধ্যবিত্তের ঐক্যের দ্বারা সমৃদ্ধ, যে ঐক্যের ভয়ে ব্রিটিশ শাসকেরা সন্ত্রস্ত ছিল; দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিল স্থানীয় বিত্তবানেরাও। রাজনীতির ওই ধারায় যদি ভারতবর্ষ স্বাধীন হতো, তাহলে আশা করার কারণ ছিল যে, দেশভাগ হতো না, বিভিন্ন জাতিসত্তা তাদের অধিকারের স্বীকৃতি পেত, এবং জাতির অভ্যন্তরে শ্রেণীবৈষম্যের অবসান না ঘটলেও অবশ্যই কমে আসত। মুক্তির জন্য প্রয়োজন ছিল যে সমাজবিপ্লবের, তার পথ তৈরি হতো। সেটা ঘটেনি। পেছনে ছিল ব্রিটিশ, সামনে ছিল কংগ্রেস ও লীগ; তারা মিলেমিশে দেশ ভাগ ঘটাল এবং স্বাধীনতার পরিবর্তে নিজেদের হাতে ক্ষমতা পেয়ে ঘোষণা করে দিল যে, স্বাধীনতা অর্জিত হয়ে গেছে। সমাজবিপ্লবের সম্ভাবনা সরে গেল পেছনে।

ব্রিটিশ যুগে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রধান পুরুষ ছিলেন গান্ধী, জিন্নাহ, নেহরু ও সুভাষ বসু। এঁদের সবাই ছিলেন বুদ্ধিজীবী। গান্ধী ও জিন্নাহ দু'জনেই ছিলেন পুঁজিবাদের সমর্থক, গান্ধী কিছুটা পরোক্ষভাবে, জিন্নাহ সরাসরি এবং একেবারে উন্মুক্ত রূপে। নেহরু সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু তিনি কংগ্রেসের নির্বাচনী ধারার রাজনীতির বাইরে যেতে পারেননি। সুভাষ বসু কংগ্রেস ছেড়েছিলেন, তিনি সমাজতন্ত্রে আস্থা রাখতেন, কিন্তু সমাজতন্ত্রকে তিনি বৈজ্ঞানিক না করে ভারতীয় করতে চেয়েছিলেন। একাত্তরের যুদ্ধে রাষ্ট্র ভাঙার ঘটনা ঘটেছে এবং তার মধ্য দিয়ে বাঙালির জাতিগত সমস্যার আদর্শিক মীমাংসা সম্ভব হয়েছে। সেটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও জরুরি একটা ব্যাপার। এই সমস্যা মীমাংসার ফলে শ্রেণীগত সম্পর্কের বিষয়টি সামনে আসবে এমন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। আগের রাষ্ট্রের অধীনে প্রধান দ্বন্দ্বটা যেহেতু ছিল বাঙালিদের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানি অবাঙালিদের, তাই শ্রেণীসম্পর্কের প্রশ্নটি ওই দ্বন্দ্বের অধীনে চলে আসছিল। তখন শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর দ্বন্দ্ব, সমাজের জন্য যেটি প্রধান সমস্যা, সেটি উন্মোচিত হয়ে যাবে এটাই ছিল প্রত্যাশিত। কিন্তু তা হয়েছে কি? না, হয়নি। হতে দেওয়া হয়নি। রাষ্ট্রক্ষমতায় যারা এলো, তারা মেহনতি মানুষকে সমান অধিকার দিতে সম্মত ছিল না, এবং তারা তা দেয়ওনি; বরং উল্টো চেষ্টা করেছে শ্রেণীদ্বন্দ্বকে অস্পষ্ট ও দুর্বল শ্রেণীগুলোকে দমিত রাখতে। অর্থাৎ সমাজবিপ্লবকে প্রতিহত করতে এবং বুর্জোয়াদের সেই পুরনো রাজনীতির ধারাকে

অব্যাহত রাখতে। এই শাসক শ্রেণী কখনো নির্বাচনের পথে, কখনো জবরদখলের পদ্ধতিতে রাষ্ট্রক্ষমতাকে নিজেদের হাতের মুঠোয় রেখে দিয়েছে।

ব্যাপারটাকে অস্বাভাবিক বলা যাবে না। মুক্তিযুদ্ধে মেহনতি মানুষ ছিল, ছিল মধ্যবিত্ত; একটি সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে রণক্ষেত্রে তাদের মধ্যে একটি ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু বিজয় হস্তগত হওয়ামাত্র দৃশ্যপট একেবারে বদলে গেছে, মধ্যবিত্ত চলে গেছে তার নিজের জায়গায়, আর মেহনতি মানুষ বাধ্য হয়েছে ম্লানমুখে নিজের স্থানে প্রত্যাবর্তনে, যদিও তার অবস্থানের জায়গাটা ততদিনে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। স্বাধীনতাপরবর্তী ইতিহাসটি মধ্যবিত্তের ধনবৃদ্ধি এবং সমাজে মানুষে মানুষে বৈষম্যবৃদ্ধির ইতিহাস বৈকি। মধ্যবিত্ত ধনী হওয়ার উন্মত্ত প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে, তারা ধন উৎপাদনে যতটা না মনোযোগ দিয়েছে তার চেয়ে বহুগুণ অধিক মাত্রায় দৃষ্টি দিয়েছে উৎপাদিত ধনসম্পত্তি লুণ্ঠনে; এবং তাদের নিজেদের মধ্যকার ক্রমবর্ধমান লুণ্ঠন প্রতিযোগিতাই হয়ে দাঁড়িয়েছে স্বাধীন দেশের রাজনীতি। স্বাধীনতা জনগণকে মুক্তি দেয়নি, শাসকশ্রেণীকে স্বাধীনতা দিয়েছে ধনী হওয়ার। এই শ্রেণী পুঁজিবাদে বিশ্বাসী। পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হতে, যুক্ত হয়ে নিজেদের তাদের সেবকে পরিণত করতে এবং দেশবাসী উৎপাদনের পরিবর্তে সেবক ও ক্রেতা হতে উৎসাহদানে তারা কোনো প্রকার কার্পণ্য করেনি। স্বভাবতই তাদের ভেতর দেশপ্রেমের বড়ই অভাব।

সমষ্টিগত মুক্তির দেশপ্রেমিক চেতনাটাই ছিল মুক্তিযুদ্ধের প্রধান শক্তি। সেই স্বপ্নের কারণেই রাষ্ট্রের আদি সংবিধানে লিখিত রাষ্ট্রীয় মূলনীতিগুলোর মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের জন্য স্থান করে দেওয়া হয়েছিল। ওই নীতিগুলোর তাৎপর্য ছিল নাগরিকদের ভেতর অধিকার ও সুযোগের সাম্য স্থাপন করা। শাসকশ্রেণী যে ওই ধরনের সাম্যে বিশ্বাস করত তা মোটেই নয়, বিশ্বাসের একটা ভঙ্গি করেছিল মাত্র, মুক্তিযোদ্ধাদের মেহনতি অংশের চাপে পড়ে এবং তাদের সেই অবিশ্বাসের প্রমাণ হাতেনাতেই পাওয়া গেছে যখন তারা প্রথম সুযোগেই শাসনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে এবং ধর্মনিরপেক্ষতার অবসান ঘটিয়েছে। শাসকশ্রেণীর বিভিন্ন অংশের মধ্যে অন্য সব ব্যাপারে ভীষণ কলহ, কিন্তু এই ব্যাপারে তারা ঐক্যবদ্ধ। বোঝা যায় শ্রেণীস্বার্থ রক্ষায় তারা কতটা অঙ্গীকারবদ্ধ। ওদিকে বুদ্ধিজীবীরা যে শ্রেণীদ্বন্দ্বের নিরসনের অর্থাৎ মেহনতি মানুষের স্বার্থের পক্ষে অবস্থান নেবেন, তেমনটা ঘটেনি। বুঝতে অসুবিধা নেই যে, বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশই হচ্ছেন হয় পুঁজিবাদে বিশ্বাসী, নয়তো উদারনৈতিক ঘারানার সদস্য। আর যারা সমাজ পরিবর্তনের পক্ষে, তারা যেহেতু সংঘবদ্ধ নন, তাই তাদের কণ্ঠ প্রায় অশ্রুতই রয়ে যায়। তাছাড়া রাষ্ট্র তাদের নিরুৎসাহিত করে, প্রচারমাধ্যম করে উপেক্ষা।

বিপ্লবের পরে প্রতিবিপ্লবী শক্তি তৎপর হয়ে উঠবে, ওঠা মোটেই অস্বাভাবিক কিছু নয়। বাংলাদেশের বেলাতেও তেমনটা ঘটতে দেখা গেছে। এখন পাকিস্তান নিজে যদিও অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত, তবু পাকিস্তানপন্থি ভগ্নাংশরা আমাদের সমাজে রয়ে গেছে, যারা অভ্যাস, মনস্তাত্ত্বিক পিছুটান, সংস্কার, পরাজয়ের গ্লানি ইত্যাদির প্ররোচনায় পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের কায়দায় বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের ধারণা তৈরিতে সচেষ্ট হয়েছে,কেউ কেউ বলেছে নতুন কোনো ঘটনা ঘটেনি, লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়িত হয়েছে মাত্র, কারো কারো মতে মুক্তিযুদ্ধ, ওটি ছিল গৃহযুদ্ধ। শ্রেণীবৈষম্যের রূঢ় সত্যকে অস্পষ্ট করে দেওয়ার জন্য শাসকশ্রেণী ধর্মকে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করতে অসম্মত হয়নি। এবং ক্ষেত্রবিশেষে প্রতিবিপ্লবীদের তৎপরতাকে যে কেবল না-দেখার ভান করেছে তা নয়, তাদের উৎসাহিতও করেছে সংগঠিত হতে, কাছে টেনে নিয়েছে নির্বাচনে জেতার কায়দার অংশ হিসেবে, ক্ষমতার অংশীদার পর্যন্ত হতে দিয়েছে। ওদিকে নিজেদের ছেলেমেয়েদের মহোৎসাহে ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষিত করে গরিব ঘরের সন্তানদের জন্য ব্যবস্থা করেছে মাদ্রাসাশিক্ষার, যাতে করে তারা ইহজাগতিক অভাব অভিযোগকে উপেক্ষা করে পারলৌকিক অর্জনের আশা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে। এসব ব্যাপারের বিরোধিতার ক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবীরা ভূমিকা রাখতে নিদারুণভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। সাতচল্লিশে এদেশ থেকে মেধার উল্লেখযোগ্য দেশত্যাগ ঘটেছিল, একাত্তরের পরেও তেমন ঘটনা ঘটেছে। মেধাবানরা অনেকেই বিদেশে চলে গেছেন। তারা বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা পালন করতে পারছেন না।

বুদ্ধিজীবীদের কর্তব্যটা পরিষ্কার, যদিও অবশ্যই কঠিন। সেটা হলো পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো। পুঁজিবাদবিরোধী লড়াইটা আজ আন্তর্জাতিকভাবে চলছে; আমাদের দেশে বিশ্বায়নের তৎপরতা অত্যন্ত প্রকট, কিন্তু আন্তর্জাতিক সংহতির বড়ই অভাব। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের দুর্বলতাগুলোর একটি ছিল আন্তজার্তিকীকরণে ব্যর্থতা; বিশ্বজনমত আমাদের পক্ষে শেষ পর্যন্ত এসেছে ঠিকই, কিন্তু বড় ধীরে ধীরে। এর কারণ ছিল। বাংলাদেশের যে জাতিগত নিপীড়নের সমস্যা, পাকিস্তানিরা যে সে রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক বাঙালিদের ওপর নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে, এই স্থূল সত্যটা বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরা হয়নি। দায়িত্বটা ছিল প্রধানত বুদ্ধিজীবীদেরই।

বুদ্ধিজীবীরা শক্তিশালী হন জনগণের সঙ্গে যদি যুক্ত হতে পারেন তবেই, নইলে নয়। যুক্ত হতে হবে আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সমষ্টিগত

স্বপ্নের ভিত্তিতে। কোনো আধ্যাত্মিক কারণে নয়, অন্তর্গত সামাজিকতার তাড়নাতেই, নিজেকে বিকশিত করার প্রয়োজনেই, এবং সবার মুক্তির মধ্য দিয়ে নিজেদের মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে। রামমোহন রায়েরা এক সময়, সেই ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, নিজেদের মধ্যে 'আত্মীয় সভা' গড়েছিলেন, বুদ্ধিজীবীদের ওই কাজটিই করা দরকার– তবে আজকের দিনে আত্মীয়তার পরিধিটিকে হতে হবে অত্যন্ত প্রসারিত, অবশ্যই সর্বজনীন, সবাই আসবেন না, আসতে পারবেনও না, কিন্তু সবার জন্য থাকবে উন্মুক্ত ও উষ্ণ আহ্বান।

শহীদ বুদ্ধিজীবীরা সে কথাটাই বলে গেছেন।